অর্থাৎ স্বাধীন ভারতে শিক্ষাকেই দেশ গঠনের প্রধান অস্ত্র বলে বিবেচনা করা হল। শিক্ষার উপর সব মানুষের সমান অধিকার স্বীকার করে নেওয়া হল। দেশের থেকে নিরক্ষরতার অভিশাপ দূর করার উপর জোর দেওয়া হল। শিক্ষা ছাড়া গণতন্ত্র টিকতে পারে না বলে শিক্ষা আবশ্যিক ও সার্বজনীন করার প্রয়াস লক্ষ্য করা গেল। শিক্ষার দ্বারাই মানব সম্পদের উৎকর্ষ এবং দেশের উন্নতি সম্ভব—এ কথা মেনে নিয়ে শিক্ষা পরিকল্পনা গ্রহণ করা হল। ইংল্যাণ্ডে শিক্ষা সম্বন্ধে জাতীয় চেতনার উন্মেষ যথেষ্ট পূর্বে ঘটে থাকলেও পরাধীনতার জন্য আমাদের জাতীয় চেতনার উন্মেষ সাধিত হতে কিছুটা বাড়তি সময় স্বাভাবিকভাবেই প্রয়োজন হয়েছে। প্রতিটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় জাতীয় আদর্শের দিকে লক্ষ্য রেখে নতুন কিছু সুপারিশ করা হয়েছে। বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার জাতীয় আদর্শের মধ্যে জনশিক্ষার প্রসার এবং অশিক্ষিতের হার কমিয়ে আনা, শিক্ষকদের অবস্থার উন্নতি করা, শিক্ষার একটা উন্নততর ও সংগঠিত রূপ দেওয়া, শিক্ষার বিভিন্ন বিভাগে মেধাবী ছাত্রদের সুযোগ ও আর্থিক সহায়তা বা বৃত্তি দান করা, অনুন্নত সম্প্রদায় ও নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ বৃত্তির ব্যবস্থা করা, দেশের প্রয়োজন অনুযায়ী বিজ্ঞান ও কারিগরী গবেষণার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করা এবং জাতীয় গবেষণা কেন্দ্র, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে জাতীয় প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রেখে গবেষণার কাজ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশন প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার দোষ-ত্রুটিগুলি সংশোধন করে একটি দেশ ও জাতিকে গঠন করার জন্য যে শিক্ষা সবচেয়ে বেশি সাহায্য করবে এবং যার সাহায্যে দেশে নিরক্ষরদের সংখ্যা হ্রাস করা সম্ভব হবে সেই প্রকারের শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নীতি ও কাজের মধ্যে প্রচুর ফাঁক থাকার জন্য তা বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীকালে এই ত্রুটি সংশোধন করার চেষ্টা করা হয়েছে। এখন আমাদের জাতীয় লক্ষ্য হল শিক্ষার মাধ্যমে মানব সম্পদের উন্নয়ন এবং দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে সেই মানবসম্পদ সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করা।

■ এবার **ইংল্যাণ্ড ও ভারতবর্ষের শিক্ষাব্যবস্থার একটা সামগ্রিক তুলনামূলক আলোচনা (Broad Comparative Study of Educational System in England and India)** করা যাক ঃ

আমরা যখন ইংরেজ শাসনাধীন ছিলাম তখন আমাদের শিক্ষানীতি ও শিক্ষাব্যবস্থা ইংরেজ শাসক যেমন চেয়েছেন তেমনভাবে নিয়ন্ত্রিত ও পরিকল্পিত হয়েছে। আমাদের প্রয়োজন, চাহিদা বা ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর কোন প্রকার গুরুত্ব দেওয়া হয় নি। যে শিক্ষানীতি ও শিক্ষাব্যবস্থা ইংল্যাণ্ডের জনসাধারণের অশেষ কল্যাণ সাধন করেছে সেই শিক্ষানীতি যদি ভারতবর্ষে প্রচলন করা হত, তাহলে ভারতের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হতে পারত। কিন্তু ইংরেজ সরকার একটি পরাধীন দেশে ঐ জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলন করার কোন প্রয়োজন ও সার্থকতা আছে বলে মনে করেন নি। একটা দৃষ্টান্ত

2020-4-1 16:4

দিলে ব্যাপারটি বোঝা সহজ হবে। উনবিংশ শতকে ইংল্যাণ্ডে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা হয়। কিন্তু ভারতবর্ষেও যখন একই দাবী করা হয় তখন নানা প্রকার অজুহাত দেখিয়ে সেই দাবী অস্বীকার করা হয়। কখনও বলা হয় দেশ ঐ জাতীয় শিক্ষা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত নয়; আবার কখনও বলা হয় অর্থের অভাব আছে। তবে ইংরেজ শাসক একটা উপকার করেছিলেন—এ দেশের শিক্ষার বনিয়াদ মোটামুটিভাবে ইংল্যাণ্ডের শিক্ষাব্যবস্থার অনুরূপে গড়ে তুলেছিলেন। আমরা ইংরেজদের দেখানো পথ ধরেই শিক্ষা জগতের পথ পরিক্রমা করে চলেছিলাম। শিক্ষাব্যবস্থায় কোন পরিবর্তন আনার কোন প্রকার অধিকার আমাদের ছিল না। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আমরা জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার একটা বিশাল সুযোগ পেয়ে গেলাম। এখন বিচার করে দেখা দরকার যে আমরা স্বাধীনভাবে কতটুকু করতে সক্ষম হয়েছি আর ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থাকে কতখানি পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত করে গ্রহণ করেছি। ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে তুলনামূলক বিচারে আমরা এখনও পিছিয়ে আছি।

❑ **ইংল্যাণ্ড ও ভারতবর্ষের প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষার তুলনা (Comparison of Pre-Primary Education in England and India) :**

ইংল্যাণ্ডে বিদ্যালয় জীবন শুরু করার পূর্বে তার প্রস্তুতি হিসাবে নার্সারী বা প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখানে স্কুলগুলিতে একটি গৃহ পরিবেশ তৈরী করে নানাপ্রকার শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। বিশেষভাবে শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকেরা শিশুদের লিখন, পঠন ও গণিতের প্রাথমিক জ্ঞানদান করতে সাহায্য করেন। এইসঙ্গে ছেলেমেয়েরা গান করে, খেলা করে, টুকিটাকি হাতের কাজ শেখে। এখানে বিনামূল্যে ছেলেমেয়েদের দুধ খেতে দেওয়া হয়। তবে এই শিক্ষা বাধ্যতামূলক নয়। যে সমস্ত স্থানে পৃথকভাবে নার্সারী স্কুল খোলা সম্ভব নয়, সেখানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গেই এই জাতীয় স্কুল খোলার কথা বলা হয়েছে।

ভারতবর্ষে প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করে নেওয়া হলেও এই শিক্ষা প্রচলন করার জন্য কোন কার্যকরী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি। ব্যক্তিগত উদ্যোগে ব্যাঙের ছাতার মত এই জাতীয় স্কুল অজস্র গজিয়ে ওঠে। এগুলি ব্যয়বহুল বলে ধনী বা উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তানেরাই এই শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করতে পারত। সরকারের কোন প্রকার নিয়ন্ত্রণ থাকত না বলে শিক্ষক নিয়োগ, ছাত্র ভর্তি, ছাত্রদের ফী, শিক্ষকদের বেতন, পাঠক্রম—কোন ব্যাপারেই কোন কড়াকড়ি বা সমতা রক্ষিত হত না—এমন কি, এখনও হয় না। আমাদের দেশে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রথম পদক্ষেপ বলা যেতে পারে বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থাকে। এই শিক্ষাব্যবস্থাতে প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার গুরুত্ব স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। সেইজন্য 'নঈ-তালিম' শিক্ষা পরিকল্পনায় ৭ বছরের কম বয়সী শিশুদের জন্য প্রাক্-বুনিয়াদী শিক্ষার ব্যবস্থা করার কথা বলা হয়েছে। তবে ভারতবর্ষের শিক্ষাব্যবস্থায় নার্সারী শিক্ষা ও প্রাক্-বুনিয়াদী শিক্ষা তেমন কোন উল্লেখযোগ্য স্থান গ্রহণ করতে পারে নি। এর অবশ্য কতকগুলি

কারণ আছে। নার্সারী স্কুলের জন্য শহরাঞ্চলে মুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে হলে যথেষ্ট খোলামেলা স্থানের প্রয়োজন, আমাদের দেশে যার একান্ত অভাব আছে। স্থানাভাব ছাড়াও অর্থাভাব, উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব ইত্যাদিও ছিল। শহরাঞ্চলে যে গুটিকতক নার্সারী স্কুল স্থাপিত হয় সেগুলি যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। একটি পরিসংখ্যানে জানা যায় ১৯৫৭ সালে সমগ্র ভারতে প্রায় ৭৭৫টি এই জাতীয় স্কুল ছিল—যদিও এগুলির নামকরণ ভিন্ন ভিন্ন হত। এই সমস্ত বিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কোন নীতি ছিল না বলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই বিদ্যালয়গুলি কিছু সুবিধাবাদী লোকের লাভজনক ব্যবসা কেন্দ্রে পর্যবসিত হয়। এখনও দেখা যায় যেখানে সেখানে বিরাট রঙীন সাইনবোর্ড টাঙিয়ে নার্সারী, কেজি ইত্যাদি স্কুল চালু করা হচ্ছে। কিছু অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান বা ছোট চুল মিনি স্কার্ট পরা মেমসাহেব শিক্ষিকা নিয়োগ করলে প্রচুর ছেলেমেয়ে ভর্তি করাও সম্ভব হচ্ছে। তবে ছাত্রদের ফী যত বেশি হবে; আড়ম্বর, চাকচিক্য বা জৌলুষ যত বেশি হবে—ঐ জাতীয় বিদ্যালয়ের আভিজাত্য তত বৃদ্ধি পাবে। এই সমস্ত বিদ্যালয় পরবর্তী শিক্ষাস্তরকে প্রকৃত সাহায্য করতে সক্ষম হচ্ছে না। তবে ইংল্যাণ্ডে এই জাতীয় বিদ্যালয় আছে বলেই যে ভারতবর্ষে তা চালু করতে হবে এমন কোন কথা নেই। এই জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে পারলে নিঃসন্দেহে তা ভাল। কিন্তু ইংল্যাণ্ডের অনুকরণে বিদ্যালয় স্থাপন করা হল— কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভব হল না, তা যেন না হয়। এই জাতীয় বিদ্যালয়গুলিকে কঠোর নিয়ন্ত্রণের আওতায় নিয়ে আসতে হবে। সুতরাং বলা যায়—প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থায় আমরা ইংল্যাণ্ডের তুলনায় পিছিয়ে আছি।

❑ ইংল্যাণ্ড ও ভারতবর্ষের প্রাথমিক শিক্ষার তুলনা (Comparison of Primary Education in England and India) :

ইংল্যাণ্ডে ১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইন অনুসারে ১২ বছর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের শিক্ষাকে প্রাথমিক শিক্ষা বলা হয়। তবে বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষা সাড়ে দশ বছর বয়স পর্যন্ত নির্দিষ্ট করা হয়েছে। নার্সারী বিদ্যালয়ে পাঁচ বছর পর্যন্ত ছেলেমেয়েরা শিক্ষা লাভ করে। ভারতবর্ষেও প্রাথমিক শিক্ষা পাঁচ বছরে শুরু হয়। এখানেও সরকারী এবং বেসরকারী দু-ধরনের প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। তবে ইংল্যাণ্ডে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক। ইংরেজরা নিজেদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় যা করেছে আমাদের দেশে তা করে নি, এমন কি দাবী করা সত্ত্বেও নয়। ইংল্যাণ্ডের শিক্ষা ১৯ বছর বয়স পর্যন্ত বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক। ভারতবর্ষে নীতির দিক থেকে প্রথমে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করার কথা স্বীকার করা হয়েছিল। তবে আমরা প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাকেই এখনও পর্যন্ত বাধ্যতামূলক বা আবশ্যিক করে উঠতে পারি নি। নানা প্রকার পরিকল্পনা, সর্বশিক্ষা অভিযান, দ্বিপ্রাহরিক আহার ইত্যাদি ব্যবস্থার মাধ্যমে সকলের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত বিনামূল্যে সরকারী পাঠ্যপুস্তক দেওয়ার ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

ভারতবর্ষে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার অনেক উন্নতিসাধন করা হয়েছে। ইংল্যাণ্ডে শিক্ষাব্যবস্থা ও পদ্ধতিকে মনোবিজ্ঞানসম্মত করার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে এবং পাঠক্রমকে শিক্ষার্থীর এবং সমাজের চাহিদা ও প্রয়োজনমত পরিবর্তিত করা হয়েছে। আমাদের শিক্ষাবিদগণও একটা পরিবর্তনের প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। স্বাধীনতার পর গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তে যুগোপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলন করার উদ্দেশ্যে মুদালিয়র কমিশন, কোঠারী কমিশন ইত্যাদি বহু কমিশন নিয়োগ করা হয়। তাছাড়া রাধাকৃষ্ণণ কমিশন সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার পর্যালোচনা করে কার্যকরী উন্নয়নমূলক কিছু প্রস্তাব দেন। পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা ও বুনিয়াদী শিক্ষার উন্নতিকল্পে কিছু কমিশন নিয়োগ করা হয়। বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও জাতীয় শিক্ষাসূচীর মাধ্যমে শিক্ষা পদ্ধতি ও পাঠক্রমে ব্যাপক পরিবর্তন আনার চেষ্টা চলছে। বুনিয়াদী শিক্ষা প্রবর্তিত হওয়ার পর তার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার কিছু পরিবর্তন সাধনের চেষ্টা করা হয়। তবে বিভিন্ন কারণে বুনিয়াদী শিক্ষা ভারতবর্ষে তেমন প্রসার লাভ করতে পারে নি। আন্তরিকভাবে চেষ্টা করলে সরকার বহু পূর্বে প্রাথমিক শিক্ষাকে আবশ্যিক এবং অবৈতনিক করতে পারতেন। সেক্ষেত্রে নিরক্ষর ও স্কুলছুটদের সংখ্যা এত বৃদ্ধি পেত না। আজও শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষাতে অপচয় ও অনুন্নয়ন বেশি। বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের দ্বি-প্রাহরিক আহারের ব্যবস্থা করে তাদের বিদ্যালয়মুখী করার চেষ্টা করা হচ্ছে। তবে ইংল্যাণ্ডে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েরা যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা পায়, আমাদের দেশে সেই জাতীয় সুযোগ সুবিধা দেওয়া সম্ভব হয় নি। আমরা এখনও উপযুক্ত খেলাধূলার ব্যবস্থা, চিকিৎসার ব্যবস্থা, লাইব্রেরী, স্কুল-টিফিন ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে পারিনি।

❑ ইংল্যাণ্ড ও ভারতবর্ষের মাধ্যমিক শিক্ষার তুলনা (Comparison of Secondary Education in England and India) :

ইংল্যাণ্ডের মাধ্যমিক শিক্ষাকাল ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত। ভারতবর্ষে দশ-শ্রেণী বিদ্যালয়ে মাধ্যমিক শিক্ষা দেওয়া হয় ১৫ বছর বয়স পর্যন্ত। যখন একাদশ শ্রেণী চালু হয় তখন তা বেড়ে ১৬ বছর পর্যন্ত হয়। বর্তমানে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীকে উচ্চ মাধ্যমিক নাম দেওয়া হয়েছে এবং শিক্ষাবর্ষ আরও একবছর বেড়ে ১৭ বছর বয়স পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়েছে। ভারতে মাধ্যমিক স্তরে ব্যাপক পরিবর্তন নিয়ে আসার চেষ্টা করা হয় মুদালিয়র কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী। তখন গতানুগতিক ও একমুখী শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তে বহুমুখী শিক্ষা পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেদের আগ্রহ, ক্ষমতা ও রুচি অনুযায়ী যে কোন একটি শিক্ষাক্রম গ্রহণ করতে পারত। অষ্টম শ্রেণীর পর নবম শ্রেণী থেকেই এই বিভাজন শুরু হত এবং একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত তিন বছর ধরে তারা এই বিশেষধর্মী শিক্ষা গ্রহণ করত। অবশ্য দশম শ্রেণী পর্যন্ত সমস্ত বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের কয়েকটি আবশ্যিক বিষয় পাঠ করতে হত। অর্থাৎ সাধারণ এবং বিশেষধর্মী শিক্ষা একই সঙ্গে দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। পরিকল্পনার দিক থেকে বিচার করলে বলা যায় ভারতের বহুমুখী শিক্ষা পরিকল্পনা ইংল্যাণ্ডের থেকে ব্যাপক

এবং শ্রেণী বিভাগটিও সুস্পষ্ট ও বিজ্ঞানসম্মত। পাঠক্রম রচনা করার সময় কমিশন ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকা দু-দেশের মাধ্যমিক পাঠক্রম দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন—এ কথা বলা যায়। ইংল্যাণ্ডের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সমাজ বিজ্ঞান ও সাধারণ বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। আমাদের দেশেও ইতিহাস, ভূগোলকে সমাজ বিজ্ঞানের মধ্যে ধরা হয় এবং গণিত, পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন বিদ্যা, উদ্ভিদ বিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা ইত্যাদির সমন্বয়ে সাধারণ বিজ্ঞানের পাঠক্রম প্রস্তুত করা হয়। ইংল্যাণ্ডে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সকলকে একটি সাধারণ পাঠক্রম অনুসরণ করতে হয়। একাদশ শ্রেণীর স্কুলে সেইজন্য অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষা গ্রহণ করার পর নবম শ্রেণী থেকে বিশেষধর্মী পাঠক্রম প্রবর্তন করা হয়। কোঠারী কমিশনের সুপারিশ মেনে বর্তমানে মাধ্যমিক শিক্ষা ১০+২ অর্থাৎ ১২ বছর ব্যাপী করা হয়েছে। এই ব্যবস্থায় সাধারণ শিক্ষা অষ্টম শ্রেণীর পরিবর্তে দশম শ্রেণী পর্যন্ত বিস্তৃত করা হয়েছে। একাদশ শ্রেণী থেকে ছাত্রছাত্রীরা তাদের রুচি ও আগ্রহ অনুযায়ী বিষয় নির্বাচন করে নেওয়ার সুযোগ পাবে। দশম শ্রেণী পর্যন্ত হবে সাধারণ শিক্ষা। মুদালিয়র কমিশনে নবম শ্রেণী থেকে যে বিশেষধর্মী শিক্ষার সুযোগ ছিল, কোঠারী কমিশন তা একাদশ শ্রেণীতে নিয়ে আসেন।

ইংল্যাণ্ডে স্পেন্স কমিটির রিপোর্টে তিন শ্রেণীর মাধ্যমিক স্কুলের সুপারিশ করা হয়েছিল—যথা **গ্রামার স্কুল, টেকনিক্যাল স্কুল ও মডার্ণ স্কুল**। এছাড়াও **সর্বার্থসাধক বা বহুমুখী স্কুল, স্বাধীন স্কুল ও পাবলিক স্কুল** নামে তিন ধরনের স্কুল প্রচলিত ছিল। তবে ইংল্যাণ্ডে মাধ্যমিক স্কুলগুলি প্রধানত দু-ধরনের—**কাউন্টি স্কুল ও ভলান্টারী স্কুল**। কাউন্টি স্কুলগুলি স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত। ভলান্টারী স্কুলগুলি বেসরকারী হলেও স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ থেকে সাহায্য পায় এবং কিছুটা হলেও তাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আমাদের দেশে অধিকাংশ স্কুলই বেসরকারী কিন্তু সরকারী অনুদানপুষ্ট। সামান্য কিছু স্কুল সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত। বেসরকারী স্কুলগুলি পরিচালনার দায়িত্ব স্থানীয় পরিচালকবৃন্দ, সরকারী শিক্ষাবিভাগ ও বোর্ডের মধ্যে বিভক্ত। প্রাদেশিক মাধ্যমিক শিক্ষার দায়িত্ব শিক্ষাবোর্ডের, কিন্তু তাদের প্রতিষ্ঠিত কোন বিদ্যালয় নেই। তাই দেখা যাচ্ছে প্রশাসন তিন ভাগে বিভক্ত। এদের মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয় করা খুবই কঠিন—তাই প্রশাসনিক কাজে খুবই অসুবিধা হয়। আমাদের দেশে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির শোচনীয় অবস্থা, আসবাবপত্র বা সাজসরঞ্জাম ইত্যাদির অভাব, উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যাও কম। তাছাড়া শিক্ষকদের বেতন ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা ইংল্যাণ্ডের তুলনায় অনেক কম। ইংল্যাণ্ডে ১৫ বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক। তাছাড়া বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা, অসুস্থদের জন্য চিকিৎসার ব্যবস্থা, পরিবহন ব্যবস্থা সবকিছু বিদ্যালয় থেকেই করা হয়। এক্ষেত্রেও আমরা ইংল্যাণ্ডের তুলনায় পিছিয়ে আছি।